পরিবেশের জন্য মানুষ না মানুষের জন্য পরিবেশ

ড. এ. কে. এনামুল হক

৫ জুন ছিল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। দিনটি কেন বা কী জন্য পালন করছি, তা হয়তো অনেকেই জানেন। সোজা কথায়, পৃথিবীকে পরিবেশ বিপর্যয়ের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনইপি) দিনটিকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। উদ্দেশ্য, পরিবেশ বিষয়ে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি করা, যাতে সবাই মিলে আমরা কিছুটা দায়িত্ব গ্রহণ এবং আমাদের ধরণীকে রক্ষা করি। ১৯৭২ সাল থেকে তা পালন করে আসছে বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশ। প্রতি বছর একটি করে বিষয় বেছে নেয়া হয় দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে। এ বছরের বিষয় ছিল, বন্যপ্রাণী বাণিজ্য বন্ধ করা। পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস কতটা কার্যকর, তা এখন গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। কারণ বাণী কিংবা র‍্যালির মাধ্যমে তা পালন করার সফলতা সম্পর্কে আমার দ্বিমত রয়েছে। এসব র‍্যালি জনমনে কতটা কৌতূহল সৃষ্টি করে আর কতটা লোক দেখানো, তা নিয়ে আমার মনে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে। তবে মোট কথা, এ নিয়ে আমরা খরচ করি। পয়সাটা হয়তোবা ভিক্ষা করে আনা হয় আর আমরা তা এভাবেই খরচ করি। যেহেতু জনগণের অর্থ নয়, তাই হয়তোবা আমরা অতটা প্রশ্ন করি না। তবে আমাদের উচিত বিষয়টি নিয়ে ভাবা। কোনো না কোনো দেশের জনগণ এ অর্থ দিচ্ছে। বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য এ নিবন্ধ।

বাংলাদেশ এক অর্থে সৌভাগ্যবান দেশ। কারণ পরিবেশ সংরক্ষণে প্রধান বাধা হয়ে থাকে অর্থমন্ত্রী। তাদের প্রধান লক্ষ্য হয় অর্থনীতির উন্নয়ন আর অর্থনীতিবিদ কুজনেট বহু আগেই প্রমাণ করেছেন যে, উঠতি অর্থনীতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দূষণমাত্রাও বাড়ে আর পরে তা ক্রমে কমে আসে। ফলে আমাদের দেশে অর্থমন্ত্রীরা বলেন, এ মুহূর্তে প্রয়োজন উন্নয়ন বৃদ্ধি, উন্নয়ন স্থবিরতা নয় আর তাই পরিবেশ-টরিবেশ হবে না। আমাদের সৌভাগ্য হলো আমাদের অর্থমন্ত্রী পরিবেশ বিষয়ে শুধুই সচেতন নন, তিনি এ দেশে একসময় পরিবেশ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ তাকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করার কোনো প্রয়োজন নেই। বিগত বাজেটে তার কতটা প্রতিফলন হয়েছে, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তবে আমি অতটা হতাশ নই। কারণ পরিবেশ বিষয়ে আমরা যতটা না বাস্তব, তার চেয়ে বেশি আবেগতাড়িত। আবেগের প্রধান সমস্যা হলো, তা মূল সমস্যা সমাধানে খুব একটি কার্যকর হয় না। কিছু উদাহরণ দিই।

এক.

বাংলাদেশ বিশ্বের সম্ভবত প্রথম দেশ, যে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করেছে। কী কারণ? কারণ ছিল নগরীতে নিষ্কাশন ব্যবস্থার কার্যকারিতা পলিথিন নষ্ট করেছে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, পলিথিন বন্ধ হলে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে। হয়েছে কি? আমার এখনো মনে আছে, সে দিন আমি দেশের একজন প্রথিতযশা পরিবেশবিদকে বলেছিলাম, এ ব্যবস্থা কার্যকর হবে না। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষকে মিলিটারি কায়দায় শাসন করা যায় না। ফলে ব্যবস্থাটি অকার্যকর হতে বাধ্য। কারণ তার বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব। দেশে কি আদৌ পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার কমেছে? নাকি তার কেবল পরিবর্তন হয়েছে? জলাবদ্ধতারও কোনো দৃশ্যমান পরিবর্তন হয়নি।

দুই.

২০০৭ সালে সরকার নদী-নালা রক্ষার জন্য প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি বা তরল বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন বাধ্যতামূলক করেছিল। ওই সময়ে একটি আলোচনায় আমি বলেছিলাম, বিষয়টি কার্যকর হবে না। কারণ গবেষণায় তাই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আমরা তা শুনিনি। প্রতিটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছি। ফলে শিল্প মালিকরা ঋণ করে তা স্থাপন করেছে কিংবা ঘুষ দিয়ে নিজেদের রক্ষা করেছে। নদী-নালার পানির কোনো দৃশ্যমান উন্নতি হয়নি।

তিন.

২০০৮ সালে আমি চীন সরকারের আমন্ত্রণে বাঘ রক্ষায় কী করা যায়, তার একটি আন্তর্জাতিক কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হই। সে দলে ছিলেন প্রায় ১২ জন বাঘ বিশারদ, যারা আন্তর্জাতিক বাঘ রক্ষা দলের কার্যকর সদস্য আর ছিল ছয়জন পরিবেশ অর্থনীতিবিদ। বলা বাহুল্য, আমার অন্তর্ভুক্তি ছিল পরিবেশ অর্থনীতিবিদ হিসেবে। চীনের প্রায় সাতটি প্রদেশে, বাঘ খামার, প্রথাগত চীনা চিকিৎসালয়, চিড়িয়াখানা, বাঘের অভয়ারণ্য দর্শন শেষে আমরা যখন বেইজিংয়ে একত্রিত হলাম তখন বুঝতে পারলাম, আমরা ছয়জনই অর্থনীতিবিদ আর বাকিরা বাঘ বিশেষজ্ঞ। আমাদের মতের সঙ্গে তাদের মতের প্রচুর দ্বিমত। রীতিমতো যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার অবস্থা আমাদের মাঝে। বাঘ বিশেষজ্ঞরা ছিলেন আবেগতাড়িত আর আমরা ছিলাম নীতিতাড়িত; কোন নীতি কার্যকর হবে কোনটি নয়। বাঘ বিশারদরা দেখছিলেন কেবল বাঘ আর আমরা দেখছিলাম বাঘ নয়, বাঘ বিলোপের পেছনে মানুষের ভূমিকা।

চার.

গত ডিসেম্বরে দিল্লির সরকার (ভারত সরকার নয়) ঘটা করে দিল্লিতে গাড়ি চালানোর জোড়-বিজোড় পক্ষ চালু করে। অর্থাৎ একদিন জোড় নম্বরের গাড়ি চলবে আর অন্যদিন বিজোড় নম্বরের গাড়ি চলবে। প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তা চালু করে দিল্লি সরকার। গত মাসে তা আবারো পালন করা হয়। উদ্দেশ্য দিল্লিতে বায়ুদূষণ মাত্রা কমিয়ে আনা। বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করে দেখা গেল, ডিসেম্বরে তা কমেছিল বটে কিন্তু গত মাসে তা কমেনি। মনে পড়ে, ডিসেম্বরে এ বিষয়ে ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে গিয়ে আমি বলেছিলাম কাজ হবে না। শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

এখন বলতে পারেন, আমি কি গণক যে, হাতের রেখা বা আকাশের তারা গুনে বলেছিলাম, তা কাজ করবে না? তা নয়, এখানে জ্ঞান বা শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই কিংবা বলতে পারেন গবেষণালব্ধ জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। এজন্যই কথায় বলে, commonsense is very uncommon. আমি প্রায়ই বলি যে, commonsense আর nonsense-এর মধ্যে পার্থক্য একটাই জ্ঞান। এ পর্যায়ে আমি কেন এ চার বিষয়ে আমার অর্থনীতির জ্ঞান ব্যবহার করে বলেছিলাম, তা কার্যকর হবে না; তার ব্যাখ্যা দিই।

এক.

পলিথিন নিষিদ্ধ করা কেন কার্যকর হবে না। প্রথমত, পলিথিনের ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ করা অসম্ভব ছিল, তা সবাই জানতেন। কারণ নানা প্যাকিং কাজে পলিথিনের বাস্তব বিকল্প তৈরি হয়নি। এ তথ্য সবাই জানতেন, তাই পলিথিন নিষিদ্ধ করার সময় নানা শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। ফলে ব্যবস্থাটির বাস্তবায়ন অসম্ভব ছিল। বুঝতে হবে আইন দ্বারা জনগণকে হয়রানি করা অতি সহজ আর এ আইন তার একটি। দ্বিতীয়ত, পলিথিন ব্যবহার বন্ধের মূল লক্ষ্য পলিথিন কিংবা পলিথিনের ব্যবহার নয়। মূল বিষয় ছিল যত্রতত্র পলিথিন ছুড়ে ফেলা। ফলে আবর্জনার সঙ্গে তা নগরের নালাগুলো বন্ধ করে দেয় আর তাতেই তৈরি হয় জলাবদ্ধতা। তৃতীয়ত, নালাগুলোয় কেন আবর্জনা হয়? পলিথিন হলো আরো শত আবর্জনার একটি। এ নালাগুলো পরিষ্কার রাখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নালায় আবর্জনার স্তূপের জন্য আমরা প্রতিষ্ঠানটিকে দায়বদ্ধ না করে খড়্গ ঝুলিয়ে দিয়েছি নিরীহ মানুষের ওপর। যাদের হয়রানি করা সহজ। পঞ্চমত, আবর্জনা যত্রতত্র ফেলে দেয়াটা কি শুধুই অভ্যাস? আমরা তো টাকা-পয়সা যত্রতত্র ফেলে দিই না! বুঝতে হবে আবর্জনাকে টাকায় রূপান্তর করলে তা কেউ ফেলে দেবে না। আমাদের উচিত, সে

একটি এলাকার সব শিল্প তার তরল বর্জ্য কেন্দ্রীয় শোধনাগারে পাইপলাইনের মাধ্যমে পাঠাবে। কেন্দ্রীয় শোধনাগারে তাদের বর্জ্য শোধন করার জন্য নির্দিষ্ট হারে ফি জমা দেবে। কেন্দ্রীয় শোধনাগার বর্জ্যের প্রকার ও গুণাগুণভেদে বিভিন্ন হারে ফি গ্রহণ করবে। এভাবে একটি বিনিয়োগের মাধ্যমে সবার বর্জ্য পরিশোধন সম্ভব। শত শত শোধনাগার স্থাপন করে অর্থের অপচয় হবে না বা শিল্প বিনিয়োগকারীদের জ্বালাতন বাড়বে না। এ পদ্ধতিতে সবচেয়ে কম খরচে এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের স্থায়ী অবকাঠামোর খরচ বাঁচিয়ে তরল বর্জ্য শোধন করা সম্ভব। দুঃখের বিষয়, এ বাজেটে সরকার শিল্প উদ্যোক্তাদের কাঁধেই শোধনের দায় চাপিয়েছেন

দিকটাতে নজর দেয়া। এ ধারণা সামনে রেখে আবর্জনাকে টাকায় রূপান্তরের নীতি তৈরি করা হলে জলাবদ্ধতা হ্রাস পাবে। নগর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে।

দুই.

কেন ইটিপি কার্যকর হবে না। তরল বর্জ্য শোধনাগার মূলত কেন্দ্রীয়ভাবে তরল বর্জ্য শোধন প্রক্রিয়ার একটি অংশ। শুধু তরল বর্জ্য শোধনাগার কার্যকর হয় না। কারণ বর্জ্য শোধন করা যে কোনো কোম্পানির জন্য একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন করা আর তা চালু রাখা এক বিষয় নয়। শোধনাগার আছে কিন্তু তা চালু না তাহলে পুরো বিনিয়োগই ব্যর্থ হবে। অথচ শোধনাগার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে চালু আছে কিনা, তা দেখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজ। তা করতে হলে প্রতিটি শোধনাগার স্থাপনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির তরল বর্জ্য পর্যবেক্ষণের নিবিড় ব্যবস্থাও চালু করতে হবে। তদুপরি তা কীভাবে শোধন হচ্ছে, তাও নজরে আনা প্রয়োজন। অর্থাৎ শোধনাগার আছে কিনা এটি একটি বিষয়। তা চালু আছে কিনা অন্য একটি বিষয় আর তা সঠিক মাত্রা ও সঠিকভাবে চালু রয়েছে কিনা তা একটি ভিন্ন বিষয়। প্রতিটি বিষয়ে নজরদারি করতে হলে পরিবেশ অধিদপ্তরকে পুলিশের চেয়েও বড় বিভাগে পরিণত করতে হবে। অন্যথায় শিল্প মালিকরা প্রধানত শোধনাগার স্থাপন করেই ক্ষান্ত হবে। শোধন করবে না বা করলেও তা কেবল পানির মিশ্রণ দিয়েই শেষ হবে। ফলে এ ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে কার্যকর হয় না।

এই ব্যর্থতার মাঝেই কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগারের সাফল্য নিহিত। এ ব্যবস্থায় একটি এলাকার সব শিল্প তার তরল বর্জ্য কেন্দ্রীয় শোধনাগারে পাইপলাইনের মাধ্যমে পাঠাবে। কেন্দ্রীয় শোধনাগারে তাদের বর্জ্য শোধন করার জন্য নির্দিষ্ট হারে ফি জমা দেবে। কেন্দ্রীয় শোধনাগার বর্জ্যের প্রকার ও গুণাগুণভেদে বিভিন্ন হারে ফি গ্রহণ করবে। এভাবে একটি বিনিয়োগের মাধ্যমে সবার বর্জ্য পরিশোধন সম্ভব। শত শত শোধনাগার স্থাপন করে অর্থের অপচয় হবে না বা শিল্প বিনিয়োগকারীদের জ্বালাতন বাড়বে না। এ পদ্ধতিতে সবচেয়ে কম খরচে এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের স্থায়ী অবকাঠামোর খরচ বাঁচিয়ে তরল বর্জ্য শোধন করা সম্ভব। দুঃখের বিষয়, এ বাজেটে সরকার শিল্প উদ্যোক্তাদের কাঁধেই শোধনের দায় চাপিয়েছেন। ফলে শিল্প উদ্যোক্তারা অহেতুক ও অকার্যকর স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করবেন। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কুঋণের পরিমাণ আরো বাড়বে। লাভবান হবে তরল বর্জ্য শোধনাগার বিক্রয়কারী কিছু বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। ২০০১ সালে বর্তমান অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটিতে যে ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করতে বলেছিলেন, বর্তমানে ঠিক তার উল্টো পদক্ষেপকে তিনিই স্বাগত জানালেন। বলা বাহুল্য, ওই কমিটির সম্পাদক হিসেবে আমিই তার সঙ্গে কাজ করেছিলাম।

তিন.

চীনে বাঘের হাড়, মাংস, রক্ত, পেশিসহ প্রায় সবকিছুরই চাহিদা আছে। চীনের প্রথাগত চিকিৎসা ব্যবস্থায় বাঘের এ ব্যবহার হাজার বছরের পুরনো। ফলে চীনে প্রায় চার প্রজাতির বাঘের প্রায় সবই বিলীন হয়েছে। বাকি রয়েছে তাদের উত্তরাংশের ১১টি বাঘ আর রয়েছে তাদের বিভিন্ন বাঘের খামার ও চিড়িয়াখানায় পাঁচ হাজার বা তার বেশি সংখ্যক বাঘ। ১৯৭৫ সালে চীন CITES চুক্তিতে সম্মতি দেয় এবং বাঘের বিভিন্ন দেহাংশের বৈদেশিক বাণিজ্যের আপাত ইতি টানে। তবে বাঘের চাহিদা রয়েই যায়। ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের চাপে চীন তাদের প্রথাগত চিকিৎসায় বাঘের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে এবং প্রথাগত চিকিৎসাশাস্ত্রে বাঘের সব উল্লেখ মুছে দেয়। শুধু তা-ই নয়, কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে চিড়িয়াখানা, বাঘের খামারগুলোর সব বাঘকে একটি ইলেকট্রনিক ডাটাব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত করে। উদ্দেশ্য, সব বাঘের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য রাখা ও এসব খামার ও চিড়িয়াখানায় বাঘের জন্ম ও মৃত্যু তথ্য অনলাইনে যুক্ত করা। চীনা বন্যপ্রাণী অধিদপ্তর এ তথ্যভাণ্ডারের পরিচালক। শুধু তা-ই নয়, মৃত্যুর পরও যেন বাঘর হাড় ও চামড়া সংরক্ষিত থাকে। তাই তাদের খামার ও চিড়িয়াখানায় একটি করে চিলরুম প্রতিষ্ঠা করে চীনা সরকার। কিন্তু তাতেও বিষয়টির কোনো সমাধান হয় না। চীনা বন্যপ্রাণী অধিদপ্তর প্রতিবছর ১৫-২০ জন চোরাকারবারিকে মৃত্যুদণ্ড আদালতের মাধ্যমে নিশ্চিত করে। আমাদের পর্যবেক্ষণে আমরা দেখতে পাই যে, ১৯৯৩ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময়ে চীনা কালোবাজারে প্রতি বাঘের দাম ১০ হাজার ডলার হতে বেড়ে ১ লাখ ডলারে উঠে যায়। বুঝতেই পারছেন, এ দামের কারণে চীনা বাজারে এখন বাঘ বাংলাদেশ বা ভারত কিংবা ইন্দোনেশিয়া হতেও চলে যেতে পারে। অর্থাৎ বাঘের ব্যবসা ও বাণিজ্য নিষিদ্ধকরণ ব্যর্থ হয়। ২০০৮ সালে চীন সরকারকে দেয়া আমাদের উপদেশ ছিল, বিশ্বের বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় মৃত বাঘের হাড় যদি চীনে পাঠানো যায় তাদের প্রথাগত চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য তবে পৃথিবীর অন্য জীবিত বাঘগুলো বেঁচে যাবে। [বলা বাহুল্য, চীনা বাজারে বছরে সর্বোচ্চ ২০০টি বাঘের চাহিদা আছে] অর্থাৎ আমাদের মতে, যেহেতু চাহিদা আছে, তাই চাহিদা শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটি সীমিত বাণিজ্যিক ব্যবস্থা চালু রাখা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাঘ বিশেষজ্ঞদের আবেগের কাছে আমাদের উপদেশ চীন সরকার গ্রহণ করতে পারেনি। মজার কথা হলো, ১৯৭৫ সালে বিপন্ন বন্যপ্রাণী রক্ষার্থে যে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা চালু হয়, তা এতটাই ব্যর্থ হয়েছে যে, এ বছর ২০১৬ সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মূল প্রতিপাদ্য হলো বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ [go wild for life] এবং তা আফ্রিকার একটি দেশ অ্যাঙ্গোলার পাঠানো প্রস্তাব।

চার.

দিল্লির আমজনতা পার্টির সরকার পরিবেশ বিষয়ে নিজেদের জনপ্রিয় করার জন্য বছরে অন্তত এক মাস পরীক্ষামূলকভাবে জোড়-বিজোড় দিবস চালু করে গত ডিসেম্বরে। ডিসেম্বরে স্কুল বন্ধ ছিল। তাই তা নিয়ে তেমন হইহুল্লা হয়নি। দূষণমানে তখন তা বেশ সাফল্যের দাবিদার হয়েছে। আবেগতাড়িত পরিবেশবাদীরা উৎফুল্ল হয়েছিল এই ভেবে যে, শহরের বায়ুদূষণের মাত্রা কমানোর একটি সঠিক নিয়ম আবিষ্কার করা গেল। কিন্তু মে-জুনে যখন তা আবার পালন করা হলো, তখন ফল উল্টো হলো। দূষণমাত্রা কমল না। মনে পড়ে, আমি ডিসেম্বরেই বলেছিলাম তা কার্যকর হবে না। কারণ? অত্যন্ত সহজ। ডিসেম্বরে যখন দিল্লির সরকার এ নিয়ম চালু করে, তখন মানুষ তৈরি ছিল না। স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় তা কার্যকর করতে সরকারকে বেগও পেতে হয়নি। কিন্তু মে মাসে তা চালু করতে গিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। স্কুল-কলেজ খোলা, দিল্লিতে অত্যন্ত গরম। তাই শেষ পর্যন্ত সরকার নিয়ম শিথিল করে। এক, মেয়েরা গাড়ি চালালে তা জায়েজ। দুই, স্কুলগামী শিশু থাকলে তা জায়েজ, ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যদিকে দিল্লির বুদ্ধিমান উচ্চ মধ্যবিত্তরা তত দিনে দুটি গাড়ি কিনে নিয়েছে। ফলে ট্রাফিক জ্যাম বেড়েছে। দিল্লির সরকার ব্যর্থতা ঢাকতে দোষ চাপালেন গাড়ি বিক্রেতাদের ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মনে পড়ে, একসময় আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন গাড়িতে একজন থাকলে তিনি জরিমানা করবেন!

বুঝতেই পারছেন, পরিবেশ সংরক্ষণ একক পরিবেশবিদদের কাজ নয়। পরিবেশ মানুষের জন্য, মানুষ পরিবেশের জন্য নয়। তাই আমরা অর্থনীতিবিদরা চেষ্টা করি মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে পরিবেশ রক্ষার ওষুধ আবিষ্কার করতে। আশা করি, বিশ্লেষণটি আমাদের পরিবেশ নীতির উন্নয়নে সাহায্য করবে।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট